পঞ্চম অধ্যায়

দ্বৈতসত্তার সম্মিলন : লেখিকা আশালতা বনাম সন্ন্যাসিনী আশাপুরী

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?"
(মহুয়া কাব্যগ্রন্থ, 'সবলা' কবিতা)

নারীজাতির অধিকার প্রাপ্তির কথা ভেবে ঈশ্বরের কাছে দাবি রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর আশালতা সেই দাবি নিয়ে অধিকার প্রাপ্তির সংগ্রামে নিজেকে শরিক করেছেন। সে সময়ে আশালতার মতো প্রগতিশীল ও আধুনিকমনস্ক মেয়ে প্রায় ছিল না বললেই চলে। ছোটবেলা থেকেই আশালতা মানুষ হয়েছেন পিতৃগৃহের মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশে, যেখানে একদিকে ছিল গণ্যমান্য সাহিত্যিক, শিল্পীব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে ছিল দেশনেতাদের সান্নিধ্য। তাঁর মনোজগত গঠনে উদারমনা পিতা যতীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আশালতার ব্যক্তিত্ব গঠনে তথা মানসিকতা তৈরিতে পিতৃ পরিবার সহায়ক ছিলেন অথচ তারাই কিনা শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আগেই তেরো বছর বয়সে বীরভূমের বাতিকারের সুপ্রাচীন রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের সন্তান ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের সংগে বিয়ে দেন। এর পেছনে ছিল সামাজিক রীতিনীতির ভয়। পিতা যতীন্দ্রমোহন এবং ভাগলপুরের শিল্প-সাহিত্যজগতে জড়িত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতায় অত্যন্ত অল্প বয়সেই ব্যক্তি আশালতার রূপান্তর ঘটে লেখিকা আশালতায়। এ প্রসঙ্গে আশালতার পুত্র নীরেন্দ্রনাথ সিংহ বলেছেন—

> *"মা অত্যন্ত কম বয়সে ১৪ বছর বয়স থেকে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। স্বর্গীয় সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ শরৎচন্দ্র এমন কি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছেন।"*[১]

আশালতা ভীষণ ভালোবাসতেন বই পড়তে, তিনি যখন ভাগলপুর

থেকে বাতিকারে শ্বশুরালয়ে আসতেন তখন তাঁকে নানা কৌশল অবলম্বন করে পড়তে হতো। কেননা, রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সুনজরে দেখতেন না মেয়েদের পড়াশুনাকে। শ্বশুরালয়ের অনীহা গ্রন্থপিপাসু আশালতাকে লেখালেখি বা পড়াশুনার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। তেমনি দেখা যায় রাসসুন্দরী এবং কবি কামিনী রায়ের জননী বামাসুন্দরীদেবীর ক্ষেত্রেও। রাসসুন্দরীদাসী নানা বাধা-নিষেধের মধ্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন। প্রথমাবস্থায় দেখা যায় তিনি শুধু পড়তেন, লিখতেন না। এ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরীদেবীর একটি উক্তি তুলে ধরছি—

> *"আমি একে তো মেয়ে। তাহাতে বউ মানুষ, মেয়ে মানুষকে লেখাপড়া শিখিতেই নাই। এটি স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রধান দোষ বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সে স্থলে আমি এ প্রকার সাজিয়া লিখিতে বসিলে লোকে আমাকে দেখিয়া কি বলিবে। বাস্তবিক আমাকে কেহ কটুবাকু বলিবে বলিয়া আমার অত্যন্ত ভয় ছিল। এইজন্য আমি লেখার বিষয় ক্ষান্ত দিয়া গোপনে গোপনে কেবল পড়িতাম।"*[২]

বামাসুন্দরীদেবীও সবার অলক্ষ্যে রান্নাঘরে কাঁচামাটির দেওয়ালে কাষ্ঠশলাকা দিয়ে অক্ষর লেখার চেষ্টা করতেন। রন্ধন শেষে গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে অক্ষরগুলো ঢেকে দিতেন। আর আশালতা শ্বশুরালয়ে ঘরের ফাঁক্-ফোকর ন্যাকড়া ও কাপড় দিয়ে বন্ধ করে পড়াশুনা করতেন। কখনও বা জানাজানি হলে তাঁকে প্রকাশ্য বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হতো। বাংলা সাহিত্যের আরেকজন লেখিকা কৈলাসবাসিনী দেবীকেও লেখাপড়া করার জন্য এমন কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মেয়েদের এই শোচনীয় পরিস্থিতির কথা কৈলাসবাসিনী দেবীর 'হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা' গ্রন্থে রয়েছে—

"যে নারী বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হন, তিনি পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির চক্ষের শূল হইয়া বহু যন্ত্রণা সহ্য করেন। তাঁহাকে ওই ব্যবসা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার গুরুজনেরা দিবানিশি উত্তেজনা করিতে থাকেন; এবং প্রতিবাসিনী কামিনীগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কত প্রকার বিদ্রূপ করেন ও স্ব-স্ব কুমারীকে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কত প্রকার বিদ্রূপ করেন ও স্ব-স্ব কুমারীকে তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপকরণে নিষেধ করেন।"[৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাগলপুরে প্র্যাকটিসকালে আশালতার পিতৃগৃহের সঙ্গে যোগাযোগ আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। নিজের বাড়ির সান্ধ্যগানের আসরে বাংলার প্রোজ্জ্বল সাহিত্যিক জ্যোতিস্কদের সান্নিধ্যে আশালতার লেখিকা ও শিল্পীসত্তার শুধু উন্মেষ ঘটেনি, ক্রমশ বিকশিত হয়ে চলছিল। আশালতা নিজেই বলেছেন—

"আমি তখন ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, বিচিত্রা সব বড় বড় কাগজে অবিশ্রান্ত লিখছি। বনফুলের বাড়িতে কখনও আমাদের বাড়িতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যা বেশ চমৎকার একটি সাহিত্যের আসর বসতো, সভায় বনফুলের বন্ধু পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কানন বিহারী মুখোপাধ্যায় সকলেই নিয়মিত আসতেন প্রতি মাসে।"[৪]

কল্পনা প্রবণ মন ও বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা শুরু হয় আশালতার। সে সময় আশালতা ছাড়া বাংলার সাহিত্য প্রাঙ্গনে শৈলবালা ঘোষজায়া, শান্তাদেবী, সীতাদেবী, জ্যোতির্ময়ীদেবী প্রভৃতি লেখিকারা একের পর

এক রচনা সম্ভার উপহার দিয়ে বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ১৯২৮ সাল থেকে আশালতার রচনা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। আশালতার লেখনীর স্টাইল তৎকালীন লেখিকাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আশালতা সিংহের যুক্তিনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণ, প্রতিবাদমুখর লেখনীর স্টাইলের জন্য পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। কারণ তৎকালীন সমাজে একজন মেয়ের রচনায় এমন বৈশিষ্ট্য কেউ-কেউ মেনে নিতে পারেননি। 'শনিবারের চিঠি'র পাশাপাশি 'বাতায়ণ' নামে আরেকটি পত্রিকায় আশালতার একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে শুধু সমালোচনা করা হয়নি সঙ্গে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল আশালতার ফটোও। ভাগলপুরে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হওয়া বলাইচাঁদের এক বন্ধু পরিমল গোস্বামী আশালতার লেখার সমালোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যাতে তিনি আশালতাকে বারণ করেন এ ধরনের লেখালেখি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে৷ কারণ এ ধরনের লেখালেখির জন্য উনি সাহিত্য মহলে তীব্র সমালোচিত হচ্ছেন। কিন্তু উল্টো একথার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলতে শোনা যায়—

"একটু গাল দিন না?"

পরিমল গোস্বামী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> *"তাঁর মুখে এমন কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। এবং দুঃখিতও হয়েছিলাম স্বভাবতই, কারণ আমি আশা করেছিলাম তিনি আমার অনুরোধ রাখবেন। কিন্তু দেখলাম দ্বিজেনবাবুর ইচ্ছা আশালতাকে শনিবারের চিঠিতে একটু গাল দেওয়া হোক। অতএব, দেখতে ইচ্ছা হলো, শেষ পর্যন্ত এর পরিণাম কি দাঁড়ায়।"*[৫]

দ্বিজেন্দ্রনাথ সমালোচকদের প্রতি রুখে না দাঁড়ানোয় সমালোচকরা

আশালতার ওপর ঘন-ঘন সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করেন। সে বিষয়ে পরিমল গোস্বামীর ধারণা—

> *"হয়তো আক্রমনটা এমন যৌথ এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির হত না, যদি দ্বিজেন্দ্রবাবুর ইচ্ছা অন্যরকম হতো।"* [৬]

স্ত্রী বর্হিজগতে সম্মানিত ও খ্যাতির অধিকারিণী হয়ে উঠুক পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় কেউ-কেউ তা মেনে নিতে পারেন না। তাতে স্বামীদের পৌরুষ ভীষণভাবে আহত হয়। হয়তো দ্বিজেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'দর্পহরণ' গল্পে যেমন দেখা যায় নির্ঝরিণীর সৃজনী প্রতিভা দেখে শ্বশুরমশাই অভিভূত৷ শ্বশুরমশাই পুত্রবধূর লেখনীকে কাগজে ছাপাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুত্রের অনিচ্ছার ফলে তার লেখনী আর কাগজে ছাপানো হয়নি। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে লেখার প্রচার হয়ে যাওয়ায় নির্ঝরিণীর স্বামী অসন্তুষ্ট হয় ও নির্ঝরিণীর লেখনী সম্পর্কে অভিমত দেয়—

> *"লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।"* [৭]

অনেক পুরুষের ধারণা থাকে 'মেয়েরা' লিখতে পারে না এমনকি রবীন্দ্রনাথও কোনো এক লেখায় মন্তব্য করেছিলেন—

> *"গ্রহণশক্তি অথবা ধারণাশক্তি থাকতে পারে, কিন্তু সৃজন শক্তি নেই।"* [৮]

রবীন্দ্রনাথের এই কথার প্রতিবাদ করেছিলেন বোন স্বর্ণকুমারী। আশালতাকে তাঁর সাহিত্যসাধনার জন্য সমাজ ও রক্ষণশীল শ্বশুরালয় থেকে নানাবিধ কটু কথা শুনতে হয় শুধু তা নয়, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয় তাই আশালতা ভেবেছিলেন সাহিত্যসাধনা থেকে দূরে সরে দাঁড়ালেই হয়তো সমস্ত অশান্তি থেকে পরিত্রাণ হবে। 'পুষ্পপাত্র' পত্রিকায় আশালতার

উদ্দেশ্যে দিলীপকুমার তাই লিখেছিলেন—

> *“তুমি লেখা ছেড়ে দেবে-দেবে বলে ভীষণ ভয় দেখাও যে।”*[৯]

আশালতা যেমন লিখতে-পড়তে পছন্দ করতেন তেমনি গান করাও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল শ্বশুরালয়ে গান গাওয়ার বিষয়েও আপত্তি থাকায় তাঁকে সেখান থেকেও সরে আসতে হয়। রাসসুন্দরীদাসীকেও ঠিক একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। রাসসুন্দরীদাসী খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে গান করার স্বাধীনতা ছিল না। রাসসুন্দরী স্বীকারক্তি—

> *“প্রকাশ্যে নয়, আমি গোপনে গোপনে গানও করিতাম।”*

আশালতার ছোট দেওর হার্টের বেরিবেরিতে মারা যাওয়ায় দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতা-মাতার একান্ত ইচ্ছেতে চিরকালের জন্য দুবরাজপুরে চলে আসেন ১৯৩৫ সালে।

আশালতাকে পুনরায় তার কাঙ্খিত ভাগলপুরের পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসতে হয় বাতিকার গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত দুবরাজপুরে। ভাগলপুর থেকে দুবরাজপুরে আসাকালীন ‘দেবী’ পদবী পরিবর্তন করে ধারণ করেন স্বামীর পদবী ‘সিংহ’। এখানে শুধু আশালতা নিজের পদবীর পরিবর্তন করলেন না, চিন্তাধারা ও জীবনধারণ পদ্ধতিতেও আনলেন রূপান্তর। এছাড়াও লেখার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমলোচিত হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের আপত্তি ও সম্মানের কথা মাথায় রেখে আশালতা লেখার স্টাইলেও পরিবর্তন এনেছিলেন। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লেখার স্টাইলের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আশালতা জানান—

"কোন-কোন পত্রিকা আমাকে হীন আক্রমণ করে বিদ্রূপ সমালোচনা করত— আমার শ্বশুরবাড়িতে তা নিয়ে কথা উঠত। আর তা ছাড়া আমার শ্বশুরবাড়ি পল্লীগ্রামে— পরিবেশের প্রভাবও হয়তো আমার মনে পড়েছিল।"[১০]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একসময় পুরুষরাই নির্ধারিত করে দিয়েছিল নারী কি লিখবে। তাইতো যে নারী পুরুষের নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করে যুক্তিনিষ্ঠ, প্রতিবাদমুখ লেখনীর স্টাইলকে নিজ লেখনীর অংশ করে তুলেছেন সেই নারীরাই পুরুষশাসিত সমাজে অপছন্দ ছিল। তাঁকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীনও হতে হত। আশালতার মতো কৃষ্ণভাবিনীদাসকেও ঠিক তেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কৃষ্ণভাবিনী সমালোচনার পরে বেশ কিছুদিন লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবার যখন লিখতে লাগলেন দেখা গেল পাল্টে গেছে তাঁর লেখনীর স্টাইল। আশাপূর্ণা দেবী এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"ছোটদের লেখা দিয়ে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। বড়দের জন্যে লিখলে তাতে তো প্রেমট্রেম আসবেই আর সে সব পড়ে গুরুজনেরা কী মনে করবেন এই নিয়ে ছিল তাঁর ভয়।"[১১]

মল্লিকা সেনগুপ্ত বলেন—

"নারীকে নিয়ে যা খুশী লেখা যায়, কিন্তু নারীরা যা খুশী লিখতে শুরু করলেই গেল গেল রব ওঠে।"[১২]

কৃষ্ণভাবিনীদেবী ও আশালতার সাহিত্য জীবনেও এমনটা ঘটেছিল। এই যুগেও দাঁড়িয়েও এমনটাই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কবিতা সিংহ, মল্লিকা সেনগুপ্ত, তসলিমার মতো লেখিকাদের। এর কারণ হিসেবে মল্লিকা বলেন—

"যা লিখি তা ডল পুতুলের ভাষা নয় বলে, তাতে ঘোমটা দিয়ে, বোরখা দিয়ে, সংস্কারের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে রাখা বৈষম্য আর বঞ্চনা প্রকাশিত হয়ে পরে বলেই এত আপত্তি। এক তেলেগু কবি মেয়ে বলেছিল, যতদিন মেয়েরা ভক্তিগীত লিখত, চাঁদ ফুল পাখির বর্ণনা লিখত, ততদিন কোন আপত্তি ছিল না, যেই না মেয়েরা গোপন যন্ত্রণার কথা, মার খাওয়ার কথা, রুখে দাঁড়ানোর কথা বলতে শুরু করল, অমনি আপত্তি। মেয়েরা যখন প্রথা ভেঙে বেরোয় তখন নিন্দার্থে নারীবাদী বলা হয় তাদের। অথচ দেখুন এতাবৎ পুরুষের লেখা জনপ্রিয় সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ কিন্তু নারীর যন্ত্রণাও বেদনাকে উপজীব্য করেই লেখা হয়েছে।"[১৩]

ভাগলপুর থেকে দুবরাজপুরে স্থানান্তর কালে লেখিকার মনোজগতে দেখা দেয় নিজের সঙ্গে নিজের চরম বিরোধ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কারণ একদিকে সাহিত্যসৃষ্টির চাহিদা অন্যদিকে বীরভূমের বিখ্যাত সিংহ পরিবারের পুত্রবধূ হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাজে পরিবারের মান-সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখা। কারণ সে সময় দেখা যায় তাঁর লেখার স্টাইল নিয়ে পত্র-পত্রিকায় নানা কুৎসামূলক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। এরূপ শোচনীয় পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত শ্বশুরালয়ের মান-সম্মানের কথা ভেবে আশালতাকে লেখনীর স্টাইলের পরিবর্তন করতে হয়। সুধীরঞ্জন লেখিকাকে তাঁর পরিবর্তিত লেখনীর স্টাইলের জন্য 'ভীরু-আদর্শবাদী' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু আশালতার এই লেখনীর স্টাইলের পরিবর্তনের পেছনে তার ভীরুতা প্রধান কারণ বললে ভুল হবে, বরং বাহবা জানাতে হবে যে সেইযুগে দাঁড়িয়ে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও

সবকিছুকে উপেক্ষা করে তার কলম থেকে বেরিয়েছে একের পর এক অবিস্মরণীয় রচনা। আশালতার শ্বশুরবাড়ির বিশাল জমিদারি ছিল দুবরাজপুরে। দ্বিজেন্দ্রনাথ জমিদারী তথা সংসার বিষয়ে উদাসীন থাকায় আশালতাকে সবকিছুরই দায়িত্ব নিতে হয়। একদিকে পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালন অন্যদিকে সে সময় করে চলছেন একের পর এক সাহিত্য সৃষ্টি। আশালতা জানান—

> *"আমরা তখন দুবরাজপুরে থাকি। স্বামী চিন্ময়ানন্দ (পূর্বাশ্রমের ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ) তখন দুবরাজপুরে প্র্যাকটিস করেন ... আমি তখন খুব লিখচি।"* [১৪]

সে সময় বাংলার সাহিত্য প্রাঙ্গনে মহিলা লেখকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কিন্তু যাঁরাই ছিলেন তাঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ 'নারী' প্রবন্ধটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে আশালতার লেখনীর অসাধারণ রচনা কৌশলকে প্রশংসা করে চিঠিও লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই চিঠিটি 'নারীর মনুষ্যত্ব' নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও আশালতার লেখনীতে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ, অচিন্ত্যকুমার আরও অনেকেই আশালতার সঙ্গে সাক্ষাৎও করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আশালতার শ্বশুরালয়ের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আশালতা এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *"আমার চব্বিশ বৎসর বয়সে দুবরাজপুরে এলাম— এখান থেকে বোলপুর খুব কাছে রবীন্দ্রনাথ আমাকে অনেক চিঠি লিখেছেন। আমাকে দেখতে চেয়েছেন এঁরা রাজি হননি।"*

তিনি আরো জানিয়েছেন—

> *"এঁরা ওসব চাইতেন না। বাইরের কোনো পুরুষের*

সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পছন্দ করতেন না। ফলে বাইরের জগতের সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।”[১৫]

ফলত রক্ষণশীল শ্বশুরালয়ের দুর্ভেদ্য বিধি-নিষেধ ও তাঁদের ইচ্ছা-পছন্দের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আশালতার। অনিতা অগ্নিহোত্রীর কথা মনে আসে এখানে—

“তুমি আমাকে যেমন রেখেছ আমি তেমন আছি
শিকড়ের কোল ঘেঁষে রাঙা বটফলের মতন
তুমি কেমন আছ, কোনও দিন জিজ্ঞেস করো না
এই কথা
আমাকে যেমন রেখেছ, আমি তেমনই আছি
ঠিক তেমন।”

(অনিতা অগ্নিহোত্রী)

১৯৩৯ সালের ৬ জানুয়ারি শ্বশুর অনিবাশ চন্দ্রের মৃত্যুর পর আশালতার জীবনে আসে বাক্ পরিবর্তন। সে সময় জমিজমা ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দ্বিজেন্দ্রনাথের ওপর এসে পরে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ এসব বিষয়ে উদাসীন থাকায় সমস্ত দায়িত্বই নিতে হয় আশালতাকে। অন্যদিকে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লেখাপড়া শেখানোর কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে আশালতার সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অবসর সময় বের করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। লেখিকার স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়—

“তখন (দুবরাজপুরে থাকাকালীন) আমারও সংসারের নানা কর্ত্তব্য ও নানা কাজ। আমার স্বামী সন্ন্যাস নেবার আগে চিরদিনই অসংসারী ছিলেন। সংসারের

কোনকিছুই কোনদিন দেখেন নাই। আমাকেই সব দেখতে হত। দেশের বাড়ির এবং ডাক্তার বাড়ির হৈচৈ, সদা অতিথি সমাগম, বড়ো ডাক্তারের কর্মময় জীবনের নানা কাজে সহযোগিতা, ছেলে ও মেয়েকে আধুনিক সর্বোচ্চ শিক্ষায় সার্থকরূপে শিক্ষিত করার জন্য সর্বপ্রযত্ন এবং নিজের সাহিত্য-সাধনা-এসব জড়িয়ে সময় বড়ো কম ছিল।"[১৬]

ফলে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে আশালতার লিখন পরিসর। সাহিত্য সৃজনেই যিনি শান্তি, তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিলেন, যখন তাঁকে পরিবারের মঙ্গল হেতু সাহিত্য সৃজন থেকে বিরত হতে হয় তখন শ্বশুরালয়ের ভিড়ের মধ্যেও নিঃসঙ্গ বোধ হয় আশালতার।

"আবার সেই নিরানন্দ, অন্ধ কারাগার, কোথাও সঙ্গ নেই, সাহিত্যের আবহাওয়া নেই।"[১৭]

তৎকালীন সমাজে অনেকেই তাঁর সৃজনী প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং নিজের পরিচয়কে গোপন রাখার জন্য নাম পরিবর্তন বা ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শৈলবালা বলেছিলেন—

*"আমি নামের পর ঘোষজায়া কেন লিখি জান?
শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে,
আমিই ওদের নতুন বউ শৈলবালা ঘোষ।"*[১৮]

কিন্তু আশালতার ক্ষেত্রে তা দেখা যায় নি। শেষপর্যন্ত পারিবারিক দায়-দায়িত্বের ফলে অবসর সময় না পাওয়ায় নিজেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহিত্য সাধনা থেকে গুটিয়ে নেন।

১৯৪০ সালে আশালতার জীবনে দেখা যায় আরেক নতুন অধ্যায়। সে সময় আশালতা সংসারে থেকেও তাঁর মন সংসার থেকে দূরে অবস্থান করছিল। সংসারের কিছুতেই শান্তি, তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষপর্যন্ত আশালতা সেই শান্তির সন্ধান পেয়েছিলেন ধর্মজীবনের দারস্থ হয়ে। দেখা যায় ধর্মজীবনে নারীর অবস্থানকে কোনকালেই পিতৃতন্ত্র কখনও অস্বীকার করেনি। কারণ নারীকে আকাঙ্খিত সমাজশাসনের জালে আটকানোর সহজসাধ্য উপায় ধর্মের অনুশাসন। স্বামী বিরজানন্দের ছত্রচ্ছায়ায় আশালতার সূচনা হয় ধর্মজীবনের। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে জীবনের প্রত্যেক স্তরেই ইচ্ছা বা আশার অপূর্ণতা। প্রথমতঃ দেখা যায় আধুনিকমনস্ক আশালতা এসে পড়লেন পল্লীসমাজের দুর্ভেদ্য রক্ষণশীল পরিবারের নিয়মনীতির টানাপোড়েনে। এই পরিবেশে আশালতা কিছুতেই তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি। আশালতার কন্যা নীলিমা সরকার জানান—

> *"আশালতা বিবাহের পরে অন্য পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি।"*

দ্বিতীয়ঃ ১৯৫৯ সালে ২৯ আগস্ট নীলিমার দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় ফাটল। নীলিমার বিবাহ বিচ্ছেদের এই মর্মান্তিক ঘটনা আশালতা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ উভয়েরই হৃদয়ে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। সাংসারিক এই দুঃখ-কষ্টকে ভুলে যাওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী (আশালতা) উভয়েই ধর্মজীবনের দিকে আরো বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছিলেন এমন ধারণা করা যেতেই পারে। আশালতা ১৪ বছর বয়সে কন্যা নীলিমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিরজানন্দের এক শিষ্যের ছেলে অরবিন্দ বিশ্বাসের সঙ্গে। জ্যোতিষশাস্ত্রনুযায়ী গ্রহ দোষের জন্য আশালতা পিতা যতীন্দ্রমোহনের মতো একই ভুল করে বসেন। আশালতা আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও নীলিমাকে অল্পবয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হল ভেবে অবাক হতে হয়। হয়তো এর পেছনে কারণ হতে পারে, আশালতা যে পরিবেশে বসবাস করছিলেন তার প্রভাব। পরিবেশ প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবেই হোক ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে। তৎকালীন মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়ার পরম্পরা প্রচলিত ছিল পল্লীবাংলায়। আশালতা ওপর পল্লী পরিবেশের প্রভাব পড়েছিল। তাই ভাগলপুরের আশালতা ও দুবরাজপুরের আশালতার চিন্তাধারা এবং জীবনধারাতে ছিল ভিন্নতা। ভাগলপুরে বসতিকালে আশালতা বলেছিলেন দাম্পত্যজীবনে মা, স্ত্রীর পরিচয় ছাড়াও এর বাইরে নিজের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলার কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে শ্বশুরালয়ের আশালতার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। আশালতার মতে—

> *"নিজের ব্যক্তিত্বকে নয় বরং পত্নীত্ব ও মাতৃত্বকে মিলিয়ে নিজের গৃহিণীত্বকে সুন্দর করে গড়ে তুলে তবে একটি মেয়ের পক্ষে সার্থক জীবন শিল্পী হওয়া সম্ভব। মেয়েদের জীবন হচ্ছে তাদের বিবাহোত্তর গৃহজীবন।"* [১৯]

১৯৫৯ সালে কাশীর ধর্মানন্দগিরির কাছে দ্বিজেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস নেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ চিন্ময়ানন্দ গিরি নামে পরিচিত হন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস গ্রহণের এক বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৬০ সালের ১০ ডিসেম্বর আশালতা সিংহ সন্ন্যাস নেন সত্যানন্দপুরীর কাছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর আশালতার নাম হয় 'আশাপুরী'। এ প্রসঙ্গে পুত্র নীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য হল—

> *"মায়ের ৫০ বছর বয়সে জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে মূলতঃ তিনি ধর্মজীবনেই আগ্রহী ও প্রবৃত্ত হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন দেওঘরের বালানন্দ আশ্রমের অনুগামিণী ও শ্রীমোহনানন্দ মহারাজের শিষ্যা ও পরমভক্ত। ৫২ বৎসর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে সংসার জীবন ত্যাগ করে তিনি নাম নেন 'আশাপুরী'।"* [২০]

এছাড়াও আশালতার সন্ন্যাস গ্রহণের পেছনে হয়তো আরেকটা কারণ হতে পারে বাপের বাড়ি ও শ্বশুরালয় উভয় পরিবারের ধার্মিক পরিবেশ। আশালতার পৈতৃক বাড়ির সঙ্গে মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর যোগসূত্র ছিল। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর আরেক নাম ছিল মহারাজ। আশালতার পৈতৃকবাড়ির প্রত্যেক সদস্যই মোহনানন্দের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আশালতা নিজেই বলেছেন—

> *"আমাদের পিতৃবংশের প্রতিটি জনে শ্রীশ্রী মহারাজের অনুগত ও শরন্যাগত্য শিষ্য।"*[২১]

এছাড়া আশালতার লিখিত 'লীলাকথা কাহিনী' থেকেও মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা জানা যায়—

> *"ভাগলপুর আমার পিতৃগৃহ, পিতৃগৃহের মাধুরী মেয়েদের মন থেকে কোনোদিনই মুছবার নয়। বিশেষ করে ভাগলপুরের সঙ্গে শ্রীশ্রী মহারাজের কতো যে স্মৃতিচারণ জড়িত আছে। তিনি ... ভাগলপুরে আমার পিতৃগৃহ একাদিক্রমে দীর্ঘদিন এসে অবস্থান করেছেন। তখন তাঁর কতো নিজস্ব সঙ্গ, সেবা কতো নিগূঢ়লীলা, কত প্রসঙ্গ, কত ভাব সমাধি এই ভাগলপুরের বুকেই ঘটেছে। সে সবের স্মৃতি ধ্যানের মণিকঠোর চিরভাস্বর।"*[২২]

আশালতার শ্বশুরালয়ে সস্ত্রীক সন্ন্যাস নেওয়ার একটা রীতি প্রচলিত ছিল। আশালতার বিয়ের পূর্বে ছোট দেওর ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন এবং সন্ন্যাস নেওয়ার পর তাঁদের নাম হয় ভূপানন্দ ও পুষ্পমা।

আশালতা নিজের স্বভাব, চাহিদা ও স্বপ্নকে পরিবর্তন করে তাল মিলিয়ে

চলার চেষ্টা করেছিলেন শ্বশুরালয়ে কিন্তু নানা মর্মান্তিক ঘটনার ঝড়ে তিনি তার সাংসারিক জীবনের গাছকে দাঁড়িয়ে রাখতে পারেননি। ফলে আশালতা ধর্মজীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ১৯৪২ সাল থেকেই সত্যানন্দপুরীর কাছে আশালতার যাতায়াত শুরু। সত্যানন্দপুরী ছিলেন স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য। আশালতার সত্যানন্দপুরীর সংগে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর পিসতুতো ভাই বিবিষানন্দের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আশালতা লিখেছেন—

> *"দুবরাজপুরে আমার পূর্বাশ্রমের দাদা স্বামী বিবিদিষানন্দের সাহচর্যে এসে আমি প্রথম অধ্যাত্ম জগতের দিকে ঝুঁকলাম এবং আমার অশেষ সৌভাগ্য ক্রমে তাঁর মধ্যবর্তিতায় একদিন জয়ের বাগানে ভগবান শ্রীশ্রী সত্যানন্দদেবের প্রথম দর্শন পেলাম।"*[২৩]

উল্লেখ্য যে, দাম্পত্যজীবনের পথে যেমন আশালতা-দ্বিজেন্দ্রনাথের মতাদর্শের সাদৃশ্য ছিল না তেমনি সন্ন্যাস জীবনেও ভিন্ন-ভিন্ন গুরুর মতাদর্শকে মেনে নেন আশালতা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর সন্ন্যাসীরা তাঁর গৃহীজীবনের স্মৃতি মুছে একটি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে নতুন জীবনের সূচনা করেন। তাঁরা তাঁদের পূর্বপরিচয় গোপন রাখেন, কারো কাছে ব্যক্ত করতে চান না, কিন্তু আশালতার ক্ষেত্রে তা হয়নি, তিনি সন্ন্যাস নিয়েও পূর্বস্মৃতি ভুলতে পারেননি। ১৯৭৫-এ ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য' সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁর পুরোনো দিনের কথা তুলে ধরেন—

> *"পিতামহের খাপড়ার ছাওনি বাড়িটিতে যেখানে শরৎচন্দ্র ভাড়া থাকতেন, সেই সামান্য ছোট বাড়িটিতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।"*[২৪]

আশালতা পুরোভাবে সন্ন্যাসব্রত পালন করতে পারেননি, পেছনপানে তাকিয়ে বারবার তাঁর মনে হয়েছে পুরোনো দিনের কথা। তাঁর অতৃপ্ত লেখিকাসত্তা সন্ন্যাসিনী জীবনে আশ্রয় খুঁজেছে, খুঁজতে চেয়েছে। 'আত্মকথা' নামে গ্রন্থটিতে আশালতা লিখেছিলেন—

> *"সাহিত্যের মধ্যে আমার হৃদয় কখন পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায়নি, তাই যখন আমি অধ্যাত্ম পথের সন্ধান পেলাম তখন তাতেই ডুবে গেলাম।"*[২৫]

রক্ষণশীল সমাজ ও পরিবারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার টানাপোড়েনে যে লেখিকাসত্তাকে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন, ১৯৫৯ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পুনরায় সেই লেখিকাসত্তার ঘটে বহিঃপ্রকাশ। তবে আর কথাসাহিত্যের জগতে না ফিরে গিয়ে তখন লিখতে লাগলেন অধ্যাত্মমূলক লেখা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসের অদিতি চরিত্রটিও আশালতার মতো ছোটবেলা থেকে ভালো লিখতে পারত। কিন্তু শ্বশুরালয় অদিতিকে পিঞ্জরাবন্ধ পাখি করে তোলায় সে ভুলেই গিয়েছিল যে তার লেখার হাত ছিল। জীবনের মধ্যসীমায় পৌঁছে অদিতির এতদিন ধরে লুকিয়ে থাকা লেখিকা সত্তা জেগে ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে—

> *"এই পঁচিশ বছর অদিতি কি অর্জন করেছে? স্বামী পুত্র সংসার সাদৃশ্য নিরাপত্তা? না কি একটু একটু করে একা হয়ে যাওয়া?"*

প্রশ্ন জাগে— 'কেন এতকাল লেখেনি অদিতি'? আশালতাও কিছুকাল লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মজীবনে পদার্পন করে পুনরায় সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হন। একসময় রক্ষণশীল শ্বশুরালয়ের বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হয়ে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি আর লিখবেন না কিন্তু তাঁর বিচলিত

মন এই সিদ্ধান্তে কিছুতেই স্থির থাকতে পারেনি; ফিরে এসেছিলেন লেখার জগতে ভিন্ন পথ ধরে।

পৃথিবীতে কোন মানুষই পূর্ণ নয়। কোনো না কোনো দিকে তাঁর অপূর্ণতা থেকে যায়। আর সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য তাঁর মন সবসময় বিচলিত থাকে। সে কষ্ট অনুভব করে। আশালতা সিংহের মনেও যন্ত্রণা ছিল সাহিত্যচর্চা থেকে দূরে সরে আসার জন্য। কিন্তু তিনি কখনও এ বিষয়ে কাউকে দোষারূপ করেননি। বরং স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তিনি সুখী এরকমই বলেছিলেন। আশালতা সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেন—

> *"তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই, দৈন্য নেই।*
> *সংসার ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি খুবই সুখী।"*[২৬]

সত্যিই কি তাই? না, কোন মানুষই তাঁর চাহিদা, ইচ্ছাকে সরিয়ে দিয়ে সুখী থাকতে পারে না। আশালতাও পারেননি, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতা দানের জন্যই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সাহিত্যসাধনায়। তবে এই পর্বের লেখনীর বিষয় ছিল ধর্ম ও অধ্যাত্মমূলক রচনা। তিনি 'ভাবমুখে' পত্রিকায় একের পর এক ধর্মমূলক প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছিলেন। ডঃ কিশোরীরঞ্জন দাশকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আশালতা জানান—

> *"এখন ধর্মগ্রন্থের উপর প্রবন্ধ এবং জীবনীগ্রন্থ লিখছি— সেগুলির নাম তোমরা হয়তো শুনতেও পারো। এই ধরনের যতগুলি ধর্মগ্রন্থ রচনা করতে পারি করব। এখন আমি 'ভাবমুখে' কিছু-কিছু প্রবন্ধ লিখছি। তোমরা 'ভাবমুখে' লেখা আমার দেখে থাকবে যদি 'ভাবমুখে' পড়ো।"*[২৭]

আশালতা আশাপুরী হয়েও লিখে গেলেন। যদিও তাঁর লেখার বিষয়

ছিল পরিবর্তিত। দেখা যায় সন্ন্যাসধর্মের দীক্ষিত হলেও মূলত তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। তাই তো বিষয় পরিবর্তিত হলেও আশাপুরী পুরোনো লেখার স্টাইলকে পুরোভাবে ছাড়তে পাড়েননি। 'অধ্যাত্ম বিষয়ক কথা' ও 'কাব্যধর্মী কথার' মিলনে তাঁর অধ্যাত্মমূলক লেখাগুলি এক বিশেষ মাত্রা লাভ করে। আশালতা আশাপুরী হয়েও যে সাহিত্যিক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখার দিকে তাকালে। তিনি একদিকে ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখছেন অন্যদিকে সন্ন্যাসিনী হওয়ার পরেও মাঝে-মাঝে লিখে গেছেন সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। যেমন— 'আমাদের ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র' এবং 'শরৎচন্দ্র ও নারীমুক্তি' এই দুটি প্রবন্ধ সন্ন্যাস জীবনে লেখা তাঁর সাহিত্যিক প্রবন্ধ।

সন্ন্যাসিনী হয়েও সাহিত্য জগতের সঙ্গে জড়িত এমন সব বিষয়ের সঙ্গে ছিল তাঁর সম্পর্ক। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭ সালে ২৩ আগস্ট বীরভূম সাহিত্য পরিষদের নতুন সদস্য হওয়ার জন্য তাঁকে আবেদন করতে দেখা যায়। বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন ড০ কিশোরীরঞ্জন দাশ। এ প্রসঙ্গে আশাপুরী সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এরকম—

> *"এবার আপনার পরিষদের ফর্মটর্ম যদি কিছু থাকে তবে আমাকে দিয়ে পূর্ণ করে নিন। ..."*
>
> *"তখন ফর্মের দাম নিতাম না, ফীজ ছিল বার্ষিক ৪ টাকা (চার টাকা)। শ্রদ্ধেয়া আশালতা সিংহ সন্ন্যাসিনী আশাপুরী সেই ফর্ম পূরণ করে দিলেন। ঠিকানা লিখলেন— পোঃ বাতিকার, জেলা- বীরভূম, গ্রাম বাতিকার। আমি তো বললাম, 'আপনি তো দুবরাজপুরে আছেন, অথচ ঠিকানা লিখলেন বাতিকার কেন?' "*

"— আমি মাঝে মাঝে বাতিকার গ্রামেই থাকি। এখনো দুবরাজপুরে স্থায়ী ঠিকানা করিনি। তাই দুবরাজপুরের নাম লিখলাম না। স্বামীর নিজস্ব বাড়ি তো বাতিকার, শ্বশুরের ভিটা।"

"— ওখানে কিভাবে আপনি যাপন করেন? উনি বললেন— আমি লেখাপড়া নিয়েই থাকি। এছাড়া ধর্মকর্ম ও দাতব্য চিকিৎসার কাজকর্ম নিয়ে আমার দিন কাটাই।"[২৮]

লেখিকা আশালতা ও সন্ন্যাসিনী আশাপুরী উভয় সত্তাতেই আশালতার লেখায় অভূতপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আশালতা বা আশাপুরী যে পরিচয়েই তিনি লিখুন না কেন তাঁর সৃষ্টিকর্ম অদ্বিতীয় এবং অবিস্মরণীয়।

উল্লেখসূত্র :

১. আশালতা সিংহ রচনাবলী, বিহার বাঙলা একাডেমি, ১৯৯০, সন্তোষকুমার মজুমদার লিখিত 'আশালতা সিংহ জীবন ও সাহিত্য প্রবন্ধের উদ্ধৃতি, পৃঃ **XXXX**

২. রাসসুন্দরী দেবী— আমার জীবন, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ১৯৯৫, দে বুক স্টোর, পৃঃ ৪৬

৩. দ্র. কৈলাসবাসিনী দেবী, 'হিন্দু মহিলাগণের হীনবস্থা', খোঁজ এখন, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩

৪. দ্র. আশালতা সিংহ রচনাবলী, বিহার বাঙলা একাডেমি, ১৯৯০, পৃঃ **XXXX**

৫. পরিমল গোস্বামী : যখন সম্পাদক ছিলাম, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, কলকাতা, পৃঃ ৮

৬. দ্র. ঐ, পৃঃ ৮

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— গল্পগুচ্ছ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- ৭০০০০৬, প্রথম দীপ সংস্করণ- জানুয়ারী ২০০২, পৃঃ ৩৭০

৮. সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— জানুয়ারি, ২০০৪, পৃঃ ৫১

৯. দিলীপকুমার রায়— 'বুদ্ধদেব বসু, বাস্তবতা ও প্রসঙ্গতঃ', পুষ্পপাত্র, বৈশাখ ১৩৪০, পৃঃ ৬১

১০. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় : পূর্বপত্র, এস.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, জুলাই ১৯৬৩, কলকাতা, পৃঃ ২১৪

১১. দ্র. সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েদের লেখালেখি, পৃঃ ৫০

১২. মল্লিকা সেনগুপ্ত, পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র, বিকাশ গ্রন্থভবন, বইমেলা ২০০২, পৃঃ ১৩৭

১৩. দ্র. ঐ, পৃঃ ১৩৭-১৩৮

১৪. আশাপুরী স্মৃতিচারণ, ভাবমুখে, আশ্বিন ১৩৮০, পৃঃ ২৮৯

১৫. দ্র. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পূর্বপত্র, পৃঃ ২১৩

১৬. সন্ন্যাসিনী আশাপুরী : রূপান্তরে মা, শ্রী সত্যানন্দ মানসকন্যা— শ্রী অর্চনাপুরী মা, শ্রী সত্যানন্দ দেবায়তন, ৭ শ্রাবণ ১৪০০, পৃঃ ৩৪

১৭. শম্পা সিন্‌হা— আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১২, আশাদীপ, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃঃ ৬১

১৮. দ্র. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পূর্বপত্র, পৃঃ ১৭৬

১৯. সংকলন অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— এপ্রিল ২০০৬, পৃঃ ১৫ (ভূমিকা অংশ)

২০. দ্র. সন্তোষকুমার মজুমদার লিখিত— আশালতা সিংহ রচনাবলী, 'আশালতা সিংহ জীবন ও সাহিত্য প্রবন্ধ', পৃঃ **XXXX**

২১. সংকলন অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ৬৪ (ভূমিকা অংশ)

২২. সন্ন্যাসিনী আশাপুরী (আশালতা সিংহ) লীলাকথা কাহিনী, শ্রীশ্রী

মোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি, প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৮, শতবার্ষিকী সংস্করণ- ২০০৪, পৃঃ ২৪-২৫

২৩. এই ডায়েরি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দ্র. অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ি সংকলিত আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, পৃঃ ৬৩

২৪. সন্ন্যাসিনী আশাপুরী (আশালতা সিংহ) : আমাদের ভাগলপুরের শরৎচন্দ্র, স্মরণী শরৎ শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা ১৯৭৫

২৫. সন্ন্যাসিনী আশাপুরী (আশালতা সিংহ) : পর্দার আড়াল থেকে, 'কল্লোল যুগ', শারদীয় কথাসাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩৮৮, পৃঃ ৬৭

২৬. দ্র. 'আশালতা সিংহর জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধ, আশালতা সিংহ রচনাবলী, পৃঃ **XVI**

২৭. ড০ কিশোরীরঞ্জন দাশ : আশালতা সিংহের শতবার্ষিকী স্মরণে, দ্র. বীরভূমি ১৪১৮, পৃঃ ৭

২৮. দ্র. ঐ, পৃঃ ৮